S. Dutta Roy
(CPI(M))

সংবিধানের

৩৭০ অনুচ্ছেদ এবং বিজেপি

—হরকিষেণ সিং সুরজিত

৩৭০ অনুচ্ছেদ এবং বি জে পি

—হরকিষেণ সিং সুরজিৎ

ভারতীয় জনতা পার্টি সংবিধানের ৩৭০নং অনুচ্ছেদটিকে তুলে দেবার দাবি করে গোটা দেশ জুড়ে প্রচার চালাচ্ছে। কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটিই নাকি দায়ী এবং এই অনুচ্ছেদটিকে তুলে দিলেই সর্বরোগহর দাওয়াই পাওয়া যাবে – বি জে পি-র প্রচার কৌশলে ৩৭০নং অনুচ্ছেদটিকে এইরকম চেহারা দেওয়া হচ্ছে। কাশ্মীরের বর্তমান অসন্তোষের কারন যে কাশ্মীরীদের সার্বিক অস্তিত্বহীনতার ভয় এবং তাদের আকাঙ্খার অপূর্ণতা, এই সত্য বি জে পি স্বীকার করতে চাইছে না। অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও বি জে পি কেন্দ্র ও রাজ্যে একই রকমের সরকারের কথা যখন বলছে তখন দেশের অভ্যন্তরে রাজ্যের হাতে অধিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দেবার মাধ্যমে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবি জোরদার হচ্ছে। প্রথমে কমিউনিষ্টরা এই দাবি তুলেছিল, পরে রাষ্ট্রীয় মোর্চা তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে এই দাবিটিকে সংযুক্ত করে।

বহু ভাষা, সংস্কৃতি, ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে ভারত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। ঐক্যবদ্ধ ভারত ও ভারতীয় দেশাত্মবোধের ধারণা বিদেশীদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে সংবিধান প্রণেতারা বিবিধের মধ্যে ভারতের ঐক্যের সূত্রটিকে লক্ষ্য করেন। এ কারণেই ভারতকে বলা হয়েছে একটি ইউনিয়ন। কিন্তু বাস্তবিকতার দিক থেকে বিচার করলে সংবিধান প্রণেতাগণ সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেননি, এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে এককেন্দ্রীক কাঠামোতে বদলে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতার এই অতি-কেন্দ্রীভবন বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মানুষদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি ইত্যাদি আন্দোলনগুলির জন্ম দিয়েছে যাতে সেই অংশের মানুষ তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, অর্থনীতি ও সামাজিক প্রগতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। জনগণের বাস্তব ক্ষোভ-সঞ্জাত আন্দোলন গুলিকে প্রতিক্রিয়ার শক্তি ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে।

কাশ্মীরের সমস্যা কিন্তু এসবের চেয়ে আলাদা। সংবিধানের ৩৭০নং অনুচ্ছেদটির বিরোধিতাও নতুন কিছু নয়। সকলেই জানেন মাউন্টব্যাটেনের

যে পরিকল্পনাটি ভারতকে দুটো ভাগে ভাগ করেছিল সেই পরিকল্পনাই এই দুটি খণ্ডের অন্তর্গত সামন্তশাসিত রাজ্যগুলির রাজাদের হাতে তাদের জনগণের হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছিল যে, তারা ভারত অথবা পাকিস্তান, পছন্দমতো যে কোন একটি দেশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে অথবা স্বাধীন থাকতে পারে। বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হায়দরাবাদ ও কাশ্মীরের সামন্ত শাসকদের উৎসাহিত করেছিল কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে স্বাধীন থাকতে। ব্রিটেনের পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূলস্রোত থেকে এই দুটি রাজ্যের জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা এবং পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে তাদের ব্যবহার করা। কাশ্মীরের মহারাজা ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে মাউন্টব্যাটেনকে চিঠি দিয়ে তাঁর স্বাধীন থাকার বাসনা প্রকাশ করেন। কাশ্মীর-রাজের এই বাসনা সমর্থন পেয়েছিল তৎকালীন জম্মু প্রজা পরিষদের কাছ থেকে। এই জম্মু প্রজা পরিষদ বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরী। কিন্তু, রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচার ও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য তৎকালীন ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্বে কাশ্মীরী জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে কাশ্মীরের রাজা শেষ পর্যন্ত চূর্ণ করতে পারেন নি।

লক্ষ্য করার বিষয়, পাশের পাঞ্জাব রাজ্য যখন দাঙ্গার আগুনে জ্বলছে, কাশ্মীরী জনগণ তখন নিজেদের রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। এই ঐক্যের কারণেই কাশ্মীর-রাজ ব্রিটিশ পরিকল্পিত স্বাধীন কাশ্মীর প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে উপজাতিদের দিয়ে কাশ্মীর অবরোধ করায়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ অফিসাররাই নেতৃত্ব দেয়। ১৯৪৭ সালের ২০শে অক্টোবর মুজফ্ফরাবাদের কাছে ব্রিটিশদের নেতৃত্বে সশস্ত্র উপজাতিরা কাশ্মীর আক্রমণ করে এবং ঝিলম উপত্যকার পথ বেয়ে শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে আসে। পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন কাশ্মীর রাজ্যের প্রশাসন এই আক্রমণে ভেঙে পড়ে। রাজা তার আত্মীয় ও উপদেষ্টামণ্ডলীকে নিয়ে জম্মুতে পালিয়ে যায়। কাশ্মীরের ইতিহাসের এই সংকটময় মুহূর্তে ন্যাশনাল কনফারেন্স এগিয়ে এসে প্রশাসনের হাল ধরে এবং আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার জন্য কাশ্মীরের সমগ্র জনগণকে আহ্বান জানায়। হাজার হাজার কাশ্মীরী-বছরের পর বছর যারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল-তারা বুঝতে পারে রাজার বিরুদ্ধে

তাদের এতদিনের সযত্ন প্রয়াসে গড়ে তোলা আন্দোলনকে আক্রমণকারীরা ধ্বংস করে দেবে। এই বিপদের মুহূর্তেই ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃবৃন্দ ভারত সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। অবশেষে কাশ্মীররাজ আবেদনে সই করতে বাধ্য হয় যাতে কাশ্মীর ভারত সরকারের সাহায্য পায়। মাউন্টব্যাটেন সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন যাতে ভারত তার সেনাবাহিনীকে কাশ্মীরের জনগণের সাহায্যে না পাঠায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

যদিও অতীত ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এই প্রবন্ধে নেই, তবুও সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও, প্রয়োজন আছে সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ও তৎকালীন ভারত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং সংগ্রামরত কাশ্মীরীদের নেতৃত্বদানকারী ন্যাশনাল কনফারেন্সের অবস্থানটিকে স্মরণ করার।

জমি বন্টন আক্রমণকারীদের পরাস্ত করার পর ন্যাশনাল কনফারেন্সের সরকার জনগণের কল্যাণের জন্য অনেকগুলি সংস্কারমূলক কাজে হাত দেয়। জমির-মালিকদের জমি বিনা ক্ষতিপূরণে চাষীদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। গ্রামীণ ও শহুরে ঋণের বোঝা কমিয়ে দেবার জন্য বোর্ড গঠন করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানী করার জন্য ও বাণিজ্যিক পণ্য রপ্তানির জন্য নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। সংবিধান প্রণয়নের জন্য সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করা হয় এবং শেষে বংশানুক্রমিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের পদ সৃষ্টি করা হয়।

সিকিউরিটি কাউন্সিল ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা কাশ্মীরের ওপর তাদের পরিকল্পনাকে চাপিয়ে দেবার নিরন্তর চেষ্টা করেছে, কিন্তু জনগণের সমর্থনে প্রতিটি ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

লক্ষ্য করার বিষয়, কাশ্মীর সরকার যখন অর্থনৈতিক সংস্কারগুলির কাজে হাত দেন তখন কাশ্মীরের ভিতরে ও বাইরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির মধ্যে প্রবল ভীতি ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছিল। যে মুহূর্তে কাশ্মীর সাংবিধানিক পরিষদ 'ল্যাণ্ড কমপেনসেশন কমিটি' ও 'বেসিক প্রিন্সিপ্‌লস কমিটি'র রিপোর্ট গ্রহণ করল—যে রিপোর্টগুলি সুপারিশ করেছিল যথাক্রমে 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ' ও বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ'—জম্মুর প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রজা পরিষদের চারিপাশে জড়ো হয়ে কাশ্মীর সরকারের বিরুদ্ধে ও সাংবিধানিক পরিষদের সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে দেয়।

প্রজা পরিষদের ন্যক্কারজনক খেলা

প্রজা পরিষদের মূল দাবি ছিল কাশ্‌মীরে ভারতের সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ অথবা জম্মুকে কাশ্‌মীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'পার্ট-বি' মর্যাদার রাজ্য হিসাবে ভারতের অঙ্গীভূত করা হোক। সেই সময় ভারতীয় সংবিধান কাশ্‌মীরের ক্ষেত্রে যে প্রযোজ্য নয় তা বর্ণিত ছিল ২৩৮নং এবং ৩১ নং অনুচ্ছেদে। ২৩৮ নং অনুচ্ছেদে বলা ছিল যে, ভারত সরকার রাজন্য ভাতা ও রাজাদের মর্যাদাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে এবং 'পার্ট-বি' রাজ্যগুলির প্রশাসনের ক্ষেত্রে রাজাদের অধিকারকে স্বীকার করছে। ভারতীয় সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটির কাশ্‌মীরে প্রয়োগের অর্থ রাজার আসনকে সুনিশ্চিত করা এবং মহারাজ হরি সিং-কে জম্মু কাশ্মীরের রাজ সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত করা। ৩১নং অনুচ্ছেদটি বিনা ক্ষতিপূরণে জমি অধিগ্রহন না করাকে সুনিশ্চিত করছে। এই অনুচ্ছেদটি জম্মু ও কাশ্‌মীরে প্রয়োগের অর্থ কাশ্মীরের আইনসভায় গৃহীত বিনা ক্ষতিপূরণে জমি অধিগ্রহণের মূল উদ্দেশ্যটিকে ব্যর্থ করে দেওয়া। জমির মালিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব উত্থাপন করার অর্থ ছিল কৃষকের হাত থেকে অধিকৃত জমি কেড়ে নেওয়া।

কাশ্মীরকে বিভক্ত করার দাবি

প্রজা পরিষদের অন্য দাবিটি ছিল—'কাশ্মীর ও ভারতের একজন রাষ্ট্রপতি ও একটিই পতাকা'। এই দাবির পেছনেও উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে আবার ফিরিয়ে আনা, কেননা, পার্ট-বি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাজাকে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে আনুগত্য স্বীকার করে রাজন্যভাতা ও রাজ-মর্যাদা গ্রহণ করতে হ'ত। বংশানুক্রমিক শাসনের অবসানের সিদ্ধান্তকে বানচাল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই দাবি তোলা হয়েছিল। ঠিক তেমনি ছিল কাশ্মীরের পতাকার প্রশ্নটি। জম্মু ও কাশ্‌মীরের সাংবিধানিক পরিষদ যে পতাকাটিকে কাশ্‌মীরের পতাকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল সেই পতাকাটি কাশ্‌মীরের জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রতীক। যতদিন কাশ্‌মীরে মহারাজার পতাকা উড্ডীন ছিল, পরিষদ নেতৃবৃন্দ ততদিন কাশ্‌মীরের জন্যও ভারতের পতাকার দাবি তোলেন নি, যেই কাশ্মীর রাজের পতাকা অন্তর্হিত হলো এবং পরিবর্তে আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে কাশমীরী জনগণ তাঁদের নতুন পতাকা গ্রহণ করলেন, তখনই পরিষদ দাবি তোলে পতাকা পরিবর্তনে।

জম্মুকে কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা—প্রজা পরিষদের এই দাবিটি ছিল

অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এই দাবিটির পিছনে ছিল কাশ্মীর ভূখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করার বাসনা। আসলে, প্রজা পরিষদ কাশ্মীরের মহারাজা, জমিদার এবং সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ চরিতার্থ করার মতো নীচ, ঘৃণিত উদ্দেশ্যে কাজ করছিল।

কাশ্মীর উপত্যকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রজা পরিষদের উৎপত্তিটাই অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ঘটনা। আর এস এস-র লেজুড় হিসাবে ১৯৩১ সালে প্রজা পরিষদ জম্মু প্রদেশে কাজ শুরু করে। জন্মলগ্ন থেকেই জম্মুর আর এস এস সংগঠনটি সামন্তবাদী স্বার্থগুলির প্রবক্তা ছিল। এরা নিরবচ্ছিন্নভাবে মহারাজার স্বাধীন কাশ্মীরের পরিকল্পনাকে সমর্থন করে গেছে। বাস্তবিক, এই সংগঠনটির একাধিক নেতৃবৃন্দ কাশ্মীরের ভারত ভুক্তিকে ১৯৪৭ সালের জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত নিরন্তর বিরোধিতা করেছে। পরবর্তী সময়ে জনসঙ্ঘের সভাপতি পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা-যিনি এই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের আর এস এস সংগঠনের সঙ্ঘচালক ছিলেন, স্বাধীন কাশ্মীরের প্রচারে নেতৃত্ব দেন। গান্ধী হত্যার পর আর এস এস-কে ঐ রাজ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অল্পকাল পরেই, ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সংগঠনটি নতুন নাম গ্রহণ করে 'প্রজা পরিষদ' এবং পূর্বতন আর এস এস-র নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদলই সংগঠনটির কাজ পরিচালনা করতে থাকে। ১৯৪৮-এর শেষের দিকে পরিষদ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীরকে বিভক্ত করার বিষাক্ত প্রচার চালায়। লক্ষ্য করবার বিষয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিবৃন্দ যখন কাশ্মীরে এলেন এবং তাঁদের রিপোর্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে পেশ করলেন এবং বিষয়টি নিয়ে যখন 'সিকিউরিটি কাউন্সিলে বিতর্ক চলছিল, পরিষদ কাশ্মীর সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য এই সময়গুলিই বেছে নিয়েছিল। যখন ডিক্সন এসে একটি অংশের জনগণের মতগ্রহণের সুপারিশ করলেন এরা তখন দাবি তুললো আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনমত গ্রহণ করতে হবে। এরপর যখন গ্রাহাম এলেন প্রজা পরিষদ ওই সময়টাও বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য বেছে নিল।

কাশ্মীরের জন্য বিশেষ মর্যাদা

ভারতের গণপরিষদ যখন সংবিধানকে গ্রহণ করল তখন ৩৭০নং অনুচ্ছেদটিও গৃহীত হয়;এবং ১৯৫২ সালের দিল্লি চুক্তি অনুসারে কাশ্মীরে আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন এবং রাজ্যের জনগণের উন্নতির প্রয়োজনে সামন্তবাদ-বিরোধী পদক্ষেপ নেবার স্বাধীনতাও রাজ্যটিকে দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রজা পরিষদের আন্দোলন ভারতের অন্যান্য অংশের জনসঙ্ঘী ও হিন্দু মহাসভার সমর্থন

লাভ করেছিল। প্রজা পরিষদের কর্মসূচী কাশ্‌মীর উপত্যকার ওপর বিষাক্ত ছায়া ফেলছিল এবং সে কারণেই উপত্যকার অন্য ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি একজোট হয়ে মুসলিম ধর্মীয় মৌলবাদের ওপর ভিত্তি করে কাশ্‌মীর রাজনৈতিক কনফারেন্স' নামে পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দল, গড়ে তোলে।

সুতরাং, ৩৭০নং ধারা বাতিলের যে দাবি এখন উঠছে তা নতুন কিছু নয়। জনসংঘ, প্রজা পরিষদ এবং আর এস এস আগেই যে দাবি তুলেছিল, এখন বি জে পি সেই দাবি করছে। এরা সকলেই একেবারে প্রথম থেকেই লাগাতারভাবে কাশ্‌মীরের বিশেষ মর্যাদার বিরোধিতা করে এসেছে। ইতিহাস অকাট্যভাবে দেখিয়ে দেয় যে, ঐ তিন দল কাশ্‌মীরের মহারাজার বিশেষ অধিকার রক্ষার সপক্ষে সবরকম চেষ্টা করেছে। কিন্তু যখনই কাশ্‌মীরী জনগণের বিশিষ্টতা রক্ষার প্রশ্ন এবং তাদের স্বশাসনের প্রশ্ন এসেছে তখনই তারা তার বিরোধিতা করেছে। এর থেকেই তাদের মতলব পরিষ্কার ধরা পড়ে।

এই ভাবেই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের খোলাখুলি সমর্থনে পাকিস্তানী হানার প্রেক্ষাপটে কাশ্‌মীরের অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ২৬শে অক্টোবর মহারাজা হরি সিং অন্তর্ভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন। পরিবর্তে, ভারত সরকার খুব স্পষ্ট করেই বলেছিল কাশ্‌মীরের ভারত অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত মীমাংসা হবে জনগণের মত গ্রহণের দ্বারা। ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে ন্যাশনাল ফ্রন্টের জেনারেল কাউন্সিল কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠনের জন্য নির্বাচন করার আনুষ্ঠানিক দাবি উত্থাপন করেছিল। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই নির্বাচন হয়েছিল। নির্বাচনে ন্যাশনাল কনফারেন্স ৪৫টি আসনের সবকটিতেই জয়ী হয়েছিল।

১৯৫১ সালের ৫ই নভেম্বর কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নিজস্ব চারটি কর্তব্য নির্ধারণ করেছিল। সেগুলি হলো, ১। জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধান রচনা করা, ২। রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা, ৩। প্রাক্তন ভূস্বামীরা তাদের ভূ-সম্পত্তির জন্য যে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা এবং ৪। ভারত অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা। ১৯৫২ সালে অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে দিল্লিতে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে ভারত সরকারকে শুধু তিনটি বিষয়ে অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সেই তিনটি বিষয় ছিল প্রতিরক্ষা পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ।

৩৭০ নং ধারার অধিকার খর্ব

দিল্লি চুক্তির পর সীমাবদ্ধ অন্তর্ভুক্তির সময়কালে জম্মু-কাশ্মীরকে যে ক্ষমতা

দেওয়া হয়েছিল ১৯৫৪ সাল থেকেই তা ক্রমাগত খর্ব করা হতে থাকলো। ১৯৫৭ সালে যে জম্মু ও কাশ্মীর সংবিধান সংশোধন আইন গৃহীত হয় তাতে ১৯৩৯ সালে গৃহীত জম্মু ও কাশ্মীর সংবিধান আইনের ৭৫নং ধারাটিকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ঐ বাদ দেওয়া ধারায় বলা ছিল, মন্ত্রী পরিষদই সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার অধিকারী।

এর পর থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরে যাবতীয় সাংবিধানিক প্রয়োগের নির্দেশ জারী করতে লাগলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। এইভাবেই জম্মু-কাশ্মীরে কেন্দ্রের অধিকারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা হলো। চুক্তিমতো রাজ্যে ভারত সরকারের অধিকার ছিল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে। কিন্তু পরে ভারত সরকারের অধিকার কেন্দ্রীয় তালিকার প্রতিটি বিষয়েই প্রসারিত করা হয়েছিল। অথচ দিল্লি চুক্তিতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল অন্তর্ভুক্তি দলিলে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তিনটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে রাজ্যের সার্বভৌম অধিকার থাকবে।

আবার ১৯৫৮ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৩১২ নং ধারা সংশোধন করে সর্ব্বভারতীয় চাকুরির ক্ষেত্রকেও জম্মু-কাশ্মীর পর্যন্ত প্রসারিত করা হলো।

১৯৬৫ সালের ৩০শে মার্চ জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন সরকারী পদের পরিভাষারও পরিবর্তন ঘটানো হলো। সদর-ই-রিয়াসৎ এবং ওয়াজিররিয়াজম এই দুই পদের নাম পরিবর্তন করে করা হলো যথাক্রমে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী।

আবার, শেখ আব্দুল্লা ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে স্থিরীকৃত চুক্তি অনুসারে ১৯৭৫ সালের ২৫শে মার্চ থেকে জম্মু ও কাশ্মীর 'ভারতের সাংবিধানিকঅংশ হিসেবে পরিগণিত হয় এবং ভারতের আইনসভা দেশের সংহতির স্বার্থে যে কোন আইন প্রণয়ন করার অধিকারী বলে স্থির হয়। সুপ্রিম কোর্ট, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য বহু কেন্দ্রীয় আইন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটির জন্যও প্রসারিত করা হয়।

অতএব, বর্তমানে কাশ্মীরের জন্য বিশেষ সুবিধা যা রয়ে গেছে তা কেবলমাত্র একটি আলাদা সংবিধান, নিজস্ব পতাকা এবং সম্পত্তি রক্ষার অধিকার। এই সুবিধাগুলি কেমন করে ভারতের সার্বভৌমত্ব অথবা জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে তা আমাদের বোধের অগম্য। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাটি এই রাজ্যের জনগণের সঙ্গে ভারতের জনগণের সংহতির ক্ষেত্রে কেমন করে ব্যবধান সৃষ্টি করছে? যা বাস্তব তা এই যে, প্রতিটি রাজ্যের জন্য অধিক ক্ষমতার দাবি

সকল রাজ্যগুলির পক্ষ থেকেই তোলা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ পরিস্থিতিকে স্মরণে রেখে আমাদের দেশের সংবিধানে এই অঞ্চলগুলির জন্য অন্যান্য অনেক অনুচ্ছেদ রাখা হয়েছে-যেমন ৩৭১ অনুচ্ছেদ অথবা ৫ম তফসিল ইত্যাদি। আমাদের সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও যে সমস্ত আদিবাসীরা ক্রীতদাসের মতো বেঁচে আছে তাদের সম্পত্তির সুরক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের সম্পত্তিকে বেনামী লেনদেনের কারণে সুরক্ষিত করা যায়নি। মিজোরাম ও নাগাল্যাণ্ডের অধিবাসীদের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কারণ স্বাধীনতা—উত্তরকালেও তাদের বাস্তব অবস্থার দিকে নজর দেওয়া হয়নি, ফলে তারা পশ্চাদপদ থেকে গেছে। একমাত্র এই মানুষগুলির আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদানের মধ্য দিয়েই দেশের ঐক্য মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারে।

একথা ভুলে যাওয়া অন্যায় হবে যে, যখন ধর্মীয় উন্মাদনার বীভৎসতা ছড়িয়ে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল, সেই সঙ্কটমুহূর্তে কাশ্মীরের জনগণ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে যুক্ত করার দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ন্যাশনাল কনফারেন্স অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল।

সংবিধানের ৩৭০নং অনুচ্ছেদটি বাতিল করার দাবি পেশ করার পরিবর্তে গভীরভাবে ভাবা উচিত যে, ১৯৪৭ সালে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের যে বীর জনগণ লড়াই করেছিল, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ভারতের ঐক্যকে সুরক্ষিত করেছিল যে জনগণ, কেমন করে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির প্ররোচনায় বিপথগামী হতে পারলো ?—এর কারণ ভারতের একটির পর একটি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বেকারিত্ব, দারিদ্র্য ও তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি চরম অবহেলা প্রকাশ করে এসেছে। কাশ্মীরী জনগণ তাদের নিজস্বতার ঐতিহ্যটিকে সুরক্ষিত ও উন্নত করতে চাইছে।

কাশ্মীরের জনগণের সমস্যাগুলির প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ। তা না করে, ৩৭০নং অনুচ্ছেদ বাতিলের দাবি তুলে হৈ চৈ করার অর্থ, যে দেশদ্রোহীরা দেশের স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করতে চাইছে তাদের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া এবং জাতীয় ঐক্যকে চরম সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া। অতএব, দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের কাছে আজকের কর্তব্য হচ্ছে

এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা, যে চ্যালেঞ্জ আসছে একদিকে পাকিস্তানে শিক্ষা-প্রাপ্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির কাছ থেকে, অপরদিকে ৩৭০ নং অনুচ্ছেদটি বাতিলের দাবি তুলে কাশ্মীরের জনগণকে ভারতীয়দের থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করে সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণকারী বি জে পি-র কাছ থেকে। দেশের মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার ওপর আরেকটি জাতিসত্ত্বার নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়ে এই ঐক্যকে সুরক্ষিত করা যায় না। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে গেলে এর থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের সঠিক ভূমিকাটিকে খুঁজে নিতে হবে। ●

With Best Compliments from :-

PANKAJ PAUL

CONTRACTOR & ORDER SUPPLIER
DEWANJEE BAZAR
SILCHAR

কুমুদ দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ পল্লী, মালুগ্রাম, শিলচর-২ থেকে প্রকাশিত